যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে লড়েছে মার্কিন গণমাধ্যম

সাবেক স্টেট সেক্রেটারি ও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নির্বাচনে মার্কিন গণমাধ্যম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেরই ধারনা ছিল ট্রাম্প জয়লাভ করবেন না, জনপ্রিয়তার দিক থেকে হিলারি ছিলেন এগিয়ে। বলা হয়, ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিতর্কিত ভুমিকা পালন করেছে। অতীতে কখনই মিডিয়ার এমন অবস্থান কেউ দেখেননি। কারণ অনেক মার্কিন পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল প্রকাশ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নেয়। আর হিলারিকে একজন ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরে, যা মার্কিন গণমাধ্যমের সুষ্ঠু নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিন্ধ করে।

শুধু তাই নয়, একদিকে ট্রাম্পের প্রশংসা এবং অন্যদিকে হিলারি ক্লিনটনের ত্রুটি ধরে তুলতে ব্যস্ত ছিল মার্কিন গণমাধ্যম। এই অবস্থানই মার্কিন জনগণের কাছে বিতর্ক তৈরি করে নির্বাচন নিয়ে। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর অনেকেই সেদেশের গণমাধ্যমকে ট্রাম্পের উত্থানের জন্য দায়ী করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে ‘ঐতিহ্যগত’ ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রথা প্রচলিত। কারণ প্রার্থীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গণমাধ্যম থেকেই বেশি পেয়ে থাকে। একজন প্রার্থীর বিষয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কতটুকু করা হচ্ছে এবং কী উপায়ে করা হচ্ছে তার প্রতি নাগরিকদের আলাদা দৃষ্টি থাকে। আর সেই দৃষ্টি থেকেই মার্কিন গণমাধ্যমের এই বিতর্কিত অবস্থান সবার নজরে আসে।

অন্যদিকে হিলারির পক্ষে যে গণমাধ্যমের অবস্থান ছিল না এমনটিও নয়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যের ১৩৪ বছর বয়সী পুরনো পত্রিকা ‘দ্য অ্যারিজোনা রিপাবলিক’ দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙ্গে অবস্থান নিয়েছিল হিলারির পক্ষে। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের

পক্ষে কাজ করা এই পত্রিকা একদিন ছাপিয়ে ফেলল – ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন’ । আর তাতেই বোঝা গেল পত্রিকাটি কাজ করছে হিলারির পক্ষ নিয়ে। এরপর আরেক নজির স্থাপন করে ইউএসএ টুডে। মার্কিন নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করা পত্রিকাটি লিখে – ট্রাম্প যোগ্য নন।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ট্রাম্প অনেক সম্পদের মালিক। সেই অনুযায়ী তিনি মার্কিন বিলিয়নিয়ারদের পক্ষে কথা বলে আসছেন। তার কাছে প্রায়োরিটি ছিল ব্যবসায়ীরা। তাই ওয়ালস্ট্রিটকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা তার পক্ষে অবস্থান নেন এবং তার প্রভাব দেখা যায় গণমাধ্যমে। তাই মার্কিন বিশ্লেষকরা কেউ কেউ মনে করেন, রাজনীতি থেকে দূরে থাকা ট্রাম্পের উত্থানের পেছনে মিডিয়ার ভুমিকা অপরিসীম। নারী বিদ্বেষী, অভিবাসী এবং মুসলিম সমাজ নিয়ে নানা কট্টর মন্তব্যের মধ্যেও তাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া মার্কিন গণমাধ্যম হিলারির ইমেইল কেলেংকারি নিয়ে যতটা সরব ছিল অতটা সরব ট্রাম্পের কর ফাঁকির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অবস্থা দেখে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, ‘মার্কিন টেলিভিশনগুলো যেন ট্রাম্পের হাতে তাদের মাইক্রোফোন তুলে দিয়েছিল’।

এছাড়া নির্বাচনকেন্দ্রিক নানা প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, বিশ্লেষকদের মতামত দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা নেই। আবার এই কারণে ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন- তার পেছনে লেগেছে গণমাধ্যম! কারণ তিনি প্রকাশ্যেই তার ক্যাম্পেইনের সময় গণমাধ্যমের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। তার পক্ষে অনেক গণমাধ্যম থাকলেও রাজনৈতিক স্টান্টের কারণে বলেছিলেন, গণমাধ্যমকে নরকে যাওয়ার কথা।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরে যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করছে, তখন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা প্রায় বিপরীত দুটি সংবাদ মাধ্যমে আস্থা রাখছে।

তাদের গবেষণায় দেখানো হয়, মিডিয়া উৎসগুলোর ব্যবহার এবং বিশ্বাসে পক্ষপাতমূলক মেরুকরণ গত পাঁচ বছরে বিস্তৃত হয়েছে। রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশ ৩০টি উৎসের মধ্যে ২০টির আস্থা প্রকাশের চেয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। মাত্র সাতটি আউটলেট রিপাবলিকানদের মধ্যে অবিশ্বাসের চেয়ে বেশি আস্থা তৈরি করে, এর মধ্যে আছে ফক্স নিউজ এবং হোস্ট শন হ্যানিটি এবং রাশ লিম্বোগের টক রেডিও প্রোগ্রাম।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য, সংখ্যাটি প্রায় বিপরীত। ৩০টি উৎসের মধ্যে ২২টিতে অবিশ্বাস প্রকাশের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ আস্থা প্রকাশ করে। ফক্স নিউজ, শন হ্যানিটি এবং রাশ লিমবাগসহ মাত্র আটটি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২০২০ সালে বাইডেন জয়লাভের পর প্রিন্স অব লিচেনস্টাইন মাইকেল এক নিবন্ধে বলেছেন, নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গণমাধ্যম, যারা পেশাদার রিপোর্টিং এবং সম্পাদনার চেয়ে তাদের মতামত এবং স্ব-সংজ্ঞায়িত ‘নৈতিকতা’ প্রচার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। নির্বাচনের পরেও সাংবাদিকতার মানদণ্ডের এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ হবে না এবং এটি আরও প্রতিফলিত হবে।

তার মতে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পোস্টের দৃশ্যমানতা সীমিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সম্প্রচার মাধ্যম এবিসি, সিবিএস, সিএনবিসি এবং এমএসএনবিসি ট্রাম্পের ভাষণে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছিলেন, তাকেও বাঁধা দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রচারটি তার বক্তব্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সিএনবিসির মডারেটর বলেন, ‘আমরা এতে বাধা দিচ্ছি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অনেকটাই অসত্য’।

তিনি মনে করেন, এটি করার মাধ্যমে, মিডিয়া আমেরিকান জনগণকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ভাষণ থেকে বঞ্চিত করেছিল। কেউ ট্রাম্পের সাথে একমত হোক বা না হোক, মার্কিন নাগরিকদের তাদের রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন তা শোনার অধিকার রয়েছে। মিডিয়ার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে- ‘ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু পচে গেছে’।